



মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী লোকজীবন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান

Tanay Roy

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

Abstract: মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যচর্চার এক বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের (সাঁওতাল, মুণ্ডা, খেড়িয়া, শবর ইত্যাদি) জীবনসংগ্রাম, বঞ্চনা ও অবহেলিত বাস্তবতার চিত্র। আলোচ্য গবেষণাধর্মী নিবন্ধটিতে ছোটগল্পে আদিবাসী লোকজীবন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নানাবিধ উপাদানের উপস্থাপন কীভাবে মহাশ্বেতা দেবীর শিল্পরীতিকে সমৃদ্ধ করেছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গল্পকার তাঁর গল্পসমূহে মূলত দু'ভাবে আদিবাসী সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন- প্রথমত, নির্দিষ্ট কোনো হারিয়ে যাওয়া প্রথা বা সংস্কারকে ভিত্তি করে ('শেষ শামানিন', 'বাঁয়েন', 'শিকার', 'শেষ বোকতা'); দ্বিতীয়ত, গল্পের মূল ভাবকে প্রস্তুত করতে আদিবাসী গান, নাচ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও উৎসবের অনুষ্ঠান ব্যবহার করে। নিবন্ধটিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি ('ইত্তালান', 'বোবো পিঠোরো'), ডাইনীপ্রথার মতো সামাজিক কুসংস্কার এবং বাৎসরিক শিকারপর্বের ('জানী-পরব') মতো লৌকিক আচার ও প্রতিবাদী ঐতিহ্যকে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। সর্বোপরি, আদিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস, ব্যবহৃত অস্ত্র, ধর্মবিশ্বাস, দেবদেবী (সিংবোঙ্গা, বনচণ্ডী, জাহের এরা) ও সংগীতের সার্থক রূপায়ণে তাঁর গল্পগুলো গভীর বাস্তবমুখী ও শৈল্পিক মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

Key Words: মহাশ্বেতা দেবী, ছোটগল্প, আদিবাসী, লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি।

Introduction: মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে এদেশের ভূমিপুত্র তথা আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে বসবাস করেও, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৬ শতাংশ হয়েও এদেশের আদিবাসী সম্প্রদায় বরাবরই সকল রকম সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিতই থেকে গেছে। জীবনযুদ্ধে নিপীড়িত, পরাজিত এইসব সাঁওতাল, মুন্ডা, খেড়িয়া, শবরদের প্রতি মমত্ববোধ দ্বারা তড়িত হয়েই আবহসংগীতের মতো মহাশ্বেতা দেবী বারবার ফিরে গেছেন তাদের কাছেই। তবে যে কোনও সম্প্রদায়ের জীবনের সঙ্গে সেই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়া কোনও জীবনই সম্পূর্ণ নয়। হোক সে আদিবাসী জীবন অথবা উন্নত নাগরিক জীবন। যেহেতু তিনি আদিবাসী জীবনকে বাস্তবসম্মতভাবে তাঁর লেখায় তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাই সঙ্গতভাবেই আদিবাসী সংস্কৃতি ছাড়া আদিবাসী জীবন একান্তভাবে অপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল- এই আদিবাসী সংস্কৃতির পরিচয় তাঁর উপন্যাসগুলোতে, যথা 'অরণ্যের অধিকার', 'চোড়ি মুণ্ডা এবং তার তীর', 'কবি বন্দ্যোপাধ্যায় গাঞির জীবন ও মৃত্যু', 'ব্যাধখণ্ড', 'কৈবর্তখণ্ড' প্রভৃতিতে যতটা পাওয়া যায় ছোটগল্পগুলোতে ঠিক ততটা পাওয়া যায় না। কারণ উপন্যাস যেহেতু আধুনিক জীবনের মহাকাব্য, তাই এতে উঠে আসে জীবনের এক সামগ্রিক রূপ। কিন্তু ছোটগল্পে জীবনের ক্ষণিক চিত্র উদ্ভাসিত হওয়ায় এক্ষেত্রে উঠে আসে টুকরো টুকরো চিত্রের কিছু কোলাজ। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পেও তাই মণিমুক্তোর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আদিবাসী লোকজীবন, সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়।

Discussion: সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা মহাশ্বেতা দেবীর গল্পসমূহে আদিবাসী সংস্কৃতি পাই দু'ভাবে। প্রথমত, অনেক ক্ষেত্রে তিনি আদিবাসী কোনও সংস্কৃতি, কোনও প্রথা বা কোনও সংস্কার অথবা কুসংস্কারকে অবলম্বন করে তিনি মূল গল্পটি

লিখেছেন। তাঁর ‘শেষ শামানিন’ ‘শেষ ঝোকতা’, ‘শিকার’ ‘বাঁয়েন’ প্রভৃতি এ ধরনের গল্প। তবে স্বভাবতই এ ধরনের গল্পের সংখ্যা অল্প। দ্বিতীয়ত, আদিবাসীকেন্দ্রিক প্রায় সকল গল্পেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আদিবাসী সংস্কৃতির কথা। যা অনেক ক্ষেত্রেই ওই গল্পের মূল ভাবটি দ্যোতিত করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে।

একসময় ওড়িশায় পাহাড়িয়া ‘লাঞ্জিয়া সাওরা’ উপজাতিদের প্রচুর বসবাস ছিল। তারা মূলত তাদের দেবতা ‘ইদিতাল’-কে সন্তুষ্ট করতে তাদের ঘরের দেওয়ালে এক ধরনের ছবি আঁকত, যাকে বলা হত ‘ইত্তালান’। তবে যে কেউ এই ‘ইত্তালান’ আঁকতে পারত না। শুধুমাত্র পুরুষ বা নারী ‘শামিন’ অথবা ‘শামানিন’-ই এই ‘ইত্তালান’ আঁকতে পারত। নৃতত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটে শামান (Shaman) হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি অদৃশ্য আত্মার জগতের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং তন্ত্র-মন্ত্র বা ধ্যানের মাধ্যমে মানুষের রোগ নিরাময় ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন।^১ স্বাভাবিক অবস্থায় নয়, কেবলমাত্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দেবতাদের নির্দেশেই সেই ‘ইত্তালান’ আঁকা হত। ‘ইত্তালান’ এখন বিরলদৃষ্ট কেননা মূল স্রোতের অভিঘাতে সাওরা জীবন ও সংস্কৃতি বহুকাল পূর্বেই উৎখাত হয়ে গেছে। ‘ইত্তালান’ এখন আর নেই। তবে ইত্তালানের মতই এক ধরনের ছবি আছে, যার নাম ‘পিঠোরো’ বা ‘বোবো পিঠোরো’। গুজরাতের রাঠোয়া ভীল উপজাতিরা তাদের ঘরের দেওয়ালে আঁকে এই ‘পিঠোরো’ যা ওদের কাছে ধর্ম অথচ ‘পিঠোরো’ ধর্মীয় চিত্র নয়। এই পিঠোরোর বৈশিষ্ট্য ধাবমান ঘোড়ার পিঠে মেয়েদের অশ্বারূঢ় ছবি। একটি ছবিতে উপর ও নীচে একরেখ ফ্রেমের ভিতরে ঘোড়া দৌড়োচ্ছে। তারপর দেখা যায় উপরে ও নীচে রেখা নেই। ফ্রেম ভেঙে ঘোড়া বেরিয়ে গেছে। ‘ইত্তালান’ না থাকলেও এই ‘পিঠোরো’ আজও বিদ্যমান এবং সজীব। এই ‘ইত্তালান’ এবং ‘পিঠোরো’ প্রথাকে অবলম্বন করেই মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন ‘শেষ শামানিন’ গল্পটি। গল্পটি লেখার মূল উদ্দেশ্যই হল এক লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। মূল ধারার সংস্কৃতির চাপে আদিবাসীরা কীভাবে ধীরে ধীরে নিজেদের বাসভূমি, সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলছে তাও তিনি গল্পটির মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন। গল্পটি লেখার পেছনে তাঁর যে অনুভূতি কাজ করেছিল সে সম্পর্কে গল্পকার নিজেই বলেছেন-

“শেষ শামানিন-এর জন্যও আমার নতুন পর্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই সাহায্য করে। বরোদা যাবার আগে ‘ভেরিয়ার এলুইন-এর আদিবাসী জগৎ’ অনুবাদ করেছি। কয়েক মাস এলুইনই পড়েছি। এলুইনের লেখায় ওড়িশার সাওরা আদিবাসীদের ‘ইত্তালান’ দেওয়াল চিত্রের কথা জেনেছি। ইত্তালানে দেখি প্রকৃতি-মানুষ-কর্ম-আনন্দ-পশুপাখি-নর্তক-নর্তকী-শিশুদের খেলা অর্থাৎ চেনাজানা পৃথিবী ও জীবন। কোনো বিশেষ দেবদেবী থাকেই কিন্তু সমগ্র ছবিটিই ধর্ম। যেন ওরা বুঝেছিল প্রবহমান জীবনধারা এবং ধাত্রী পৃথিবী ও ধর্ম সমার্থক। সাওরাদের ইত্তালান বিষয়ে পরে এক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনলাম। হিন্দু ও খ্রিস্টান মৌলবাদীরা স্বাধীনতার আগে থেকেই ওদের জীবনে ঢুকছিল। অ-সভ্যদের সভ্য করতে হবে। এমন সব জংলি ছবি ওদের ধর্ম? মূলস্রোতের এই আক্রমণে নিরীহ ওরা ভয় পেয়ে যায়। ক্রমেই ইত্তালান মুছে যেতে থাকে। আজ আবার তা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বলে শুনিনি। ১৯৯৮-এর মার্চে ছোট্ট উদেপুর জেলার রাঠোয়া ভীল অধ্যুষিত তেজগড়ে গিয়ে প্রথম ধাক্কা খাই দেওয়ালে পিঠোরো বা বোবো পিঠোরো দেখে। এখানেও চলমান জীবন, ঘোড়ার পিঠে পুরুষ ও নারী। এই পিঠোরো দেওয়ালচিত্র ও ধর্ম সমার্থক। মনে হল, ইত্তালান নেই, পিঠোরো তো আছে।”^২

‘শেষ শামানিন’ গল্পটির মূল চরিত্র কৈতি এবং তার পিতামহী নান্দি। এই নান্দি একজন শামানিন, যার একমাত্র উত্তরাধিকারী কৈতি। কৈতির পিতামহের কাল থেকেই তারা ঠিকাদারের ভ্রাম্যমাণ লেবার। কৈতিরা কবে থেকে পথে পথে ঘুরছে, কোথায় যাচ্ছে সেটা তাদের নিজেদের জানা নেই। ঠিকাদার ঘনশ্যাম অদৃশ্য জাদুলাঠি দিয়ে তাদের মুম্বাই, পুনে, নাসিক, আমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট, রাজকোট -সব জায়গাতেই কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ঘনশ্যামের দলে কৈতি একটা ‘অ্যাসেট’। তার চেহারা বয়সের লাভণ্য নেই। কঠোর পরিশ্রমে পেটানো শরীর। চেলি ও শাড়ি পরে, সঙ্গে ওড়না। ঘন কালো চুল সিঁথি উলটে পরিপাটিভাবে বিনুনি করা। দু’কানে ছটা মাকড়ি, গলায় হাঁসুলি, হাতে খাড়া। চোখ ওর শরীরের মতোই কালো, দৃষ্টি দুর্বোধ্য, পর্দা ফেলা। ও যেমন কাজের তেমনই শক্তসমর্থ। পঁচিশজনের দলে ওই সর্দার। টাকা পয়সার হিসেবে ওর মাথা যেন কম্পিউটারের কাজ করে। ওর স্থির, সংযত ও স্বল্পবাক্য গভীর ব্যক্তিত্ব ঘনশ্যামের লেবার ক্যাম্পে একটা ভালো প্রভাব বিস্তার করেছে। এছাড়া নান্দি আজ শামানিন, কাল কৈতি হবে। এ কারণেও কৈতিকে কেউ কিছু বলে না। নান্দিকে সবাই সম্মিহ করে, এড়িয়ে চলে। কারণ-

“নান্দি একজন শামানিন। ওর যৌবনে দেবতারা এসে জানাত, আমার ইত্তালান আঁকো। ও লালমাটি লেপে দেওয়ালে রঙ করত। তারপর চাল বেটে সাদা রঙ, কাঠকয়লা জলে ঘষে কলো রঙ তৈরি রাখত। দেওয়ালে বুলিয়ে দিতে বীজ শস্যের ছড়া-মুরগি বলি দিত, তারপর, দেবতাদের ইচ্ছেমত ছবি আঁকত। আঁকত আকাশ, চাঁদ, সূর্য, তারা, বৃষ্টি শস্যক্ষেত্র, গাছ, কুটীর, কৃষক, গোয়ালা, শিকারি, নর্তক-নর্তকী, বাদক-বাদকী, বাঘ, হরিন-গোরু, ছাগল, মোষ-ক্ৰীড়ামত্তশিশু, একটা পৃথিবীই একে দিত। দেবতা, মাটি, অরণ্য, পাহাড়, নদীর সঙ্গে ও কথা বলেছে একদিন।”৩

-এই কৈতি ছাড়া নান্দি শামানিন আর কাউকেই জানে না, কারো সাথে কথাও বলে না, বসে বসে ঝিমায়, আর হঠাৎ হঠাৎ কৈতির কানে কানে এক-একটা কথা বলে। কৈতিকে জানায় অনেক না বলা ইতিহাস- কীভাবে তারা দেশান্তরী হল, সাওরা জনপদ মহাজন, বেনে, ঠেকেদার দ্বারা উচ্ছেদ হবার পর তাদের ধর্মীয় দেওয়ালচিত্র কীভাবে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত হল ইত্যাদি। গল্পকার এক অদ্ভুতভাবে নিরপেক্ষ অথচ ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় পাঠককে জানিয়েছেন-

“...পরিত্যক্ত গ্রামে সেই আশ্চর্য চিত্রমণ্ডিত দেওয়াল দেখে সবাই স্তম্ভিত ও অবাক। যেন ভীরা ও অদেখা কিছু হঠাৎ দেখার ভয়। সাওরারা দেশান্তরী, যাযাবর হয়ে যাচ্ছে, সবাই জানে। কয়েক বছর ধরেই ওরা চলে যাচ্ছে। তবু, নয়াবসতির লোকজন মাথা নাড়ল। ছিটানো চাল, শুকনো ফুল, বিবর্ণ রক্ত, এ নিশ্চয় ওদের দেবস্থান। সমীহ করো। ওটি ঘিরে পাঁচিল ওঠে, বাইরে বাসের রাস্তা, দোকান বাজার। তারপর কোনো দিন আলোকচিত্রী আসে। অনেক, অনেক ছবি তোলে। সে সব ছবি যায় শহরে। তারপর ব্লক, প্রিন্টে লক্ষ লক্ষ বেডকভারে, পরদায়, শাড়িতে ছাপা হয় সূর্যদেবতা, অরণ্যদেবী, তৃণপ্রান্তরের দেবদেবী, তাঁদের বিচিত্র ঘরদোর, আকাশে, সূর্য শিকারে ধাবমান এক মৃগয় সাওরা যুবক। ইত্তালান বাজারিয়া মাল হয়ে যায়। আর সাওরাদের প্রত্যাবর্তনের আশায় অপেক্ষমাণ ‘সকল অসুমের-অ গ্রহ’ ক্রমে জীর্ণ হয়। সুমেরো মণ্ডপ এখন ব্যস্ত জংশন, রমরমা চোলাই মদের বাজার।”৪

এভাবেই সাওরা জনজাতির মত ইত্তালানও হারিয়ে যায় নগরের কংক্রিটের জঙ্গলে। নান্দি শামানিন যেমন কৈতিকে তাদের পূর্বজীবনের ইতিহাস শোনায়ে, তেমনই তাকে স্বপ্ন দেখায় ইত্তালান আঁকার। কারণ কৈতি-ই তো সাওরাদের ‘শেষ শামানিন’। নান্দি শামানিনের স্বপ্ন দেখানো আর কৈতির স্বপ্ন দেখতে শেখা -এ-দুয়ে মিলে চলতে চলতে গল্পটি এক সময় বেড়ো অদ্ভুতভাবে শেষ হয়। নান্দি মারা যাওয়ার পর কৈতি নিজের মধ্যে ইতিহাসকে কথা বলতে শোনে। পথই ওকে নিয়ে যায় ধারি গ্রামে বোবো পিথোরোর নামে উৎসর্গিত দেবস্থানরক্ষী মাটির ঘোড়ার কাছে শরণ দিতে। তারপর ও নিজেই ঢুকে যায় ছবিতো-

“...পরদিন তিনপ্রহর রাতে ও হৃদয়ে বোঝে, ও ওর গন্তব্যের কাছাকাছি এসেছে, সময়ের বেড়া টপকে সময় হীনতায় পৌঁছেবে এবার। ...সহসাই সে দেখেছিল অতিকায় এক মাটির ঘোড়া, দেখ, অন্ধ কিষণ নাইকা রেখে গেছে, কৈতি ছুঁলেই লাফিয়ে উঠবে। নাকি কৈতিকে নিয়ে চলে যাবে, ও যেখানে যেতে চেয়েছিল? নান্দি তো তাই বলেছিল। সব শক্তি যেন নেমে যাচ্ছে। পা ঘষে ঘষে কৈতি ঘোড়াটির কাছে যায়, ঘোড়ার চোখ আর পা বলে, দেরি কেন? কৈতি ঘোড়াটির গলা জড়িয়ে ধরতে চায়, দু হাত বাড়ায়। ...আর নগিন রাঠোয়া, এক তরুণ ভীল, রাতে কোনো দুরন্ত তাগিদের তাড়নায় ওর ঘরের দেওয়ালে একটি ঘোড়া আঁকে, যার উপরে ও নীচে ফ্রেমের বন্ধনরেখা নেই। ফ্রেম ছেড়ে কালো ঘোড়াটি সব বাধা বন্ধ ভেঙে দৌড়ছে। তার কেশর জাপটে বসে আছে একটি কালো মেয়ে। এভাবেই পুর্বের সাওরা মানুষদের শেষ শামানিন, পশ্চিমের রাঠোয়া ভীলদের পিথারো চিত্রে জায়গা পায়। নিজেই হয়ে যায় নিজের ইত্তালান, যার ঘোড়া ধাবমান কোন সময়হীন অনন্তের দিকে। আর ওকে সৌধ গড়ে অন্যদের হাতে তুলে দিতে হবে না।”৫

-গল্পকার যেভাবে শেষ পর্যন্ত গল্পটিকে বাস্তবের ফ্রেম ভেঙে একটা পরাবাস্তব জগতে নিয়ে গেছেন, তা পাঠকের চোখে বিস্ময়কর।

ডাইনীপ্রথার মতো গ্রামাঞ্চলে, অন্ত্যজ সমাজে প্রচলিত আর-একটি নিষ্ঠুর প্রথা হল ‘বাঁয়েন’। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক মনে করে বাঁয়েন কোনও ছোটো ছেলে বা পুরুষকে দেখে শুধুমাত্র চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে। তাই

বাঁয়েনকে থাকতে হয় গাঁয়ের বাইরে। বাঁয়েন যখন পথ চলে তখন তাকে টিন বাজিয়ে সাড়া দিতে দিতে যেতে হয়, যাতে যুবা বুড়ো সব পথ ছেড়ে সরে যেতে পারে। এরকমই এক কুসংস্কারের ভয়াবহ স্বরূপ আমরা দেখি মহাশ্বেতা দেবীর ‘বাঁয়েন’ গল্পে। গল্পকার এই গল্প লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লিখেছেন-

“ইতিহাস, শ্রুতিকথা, পুরা কথা, মিথ, কিংবদন্তি, পুরাণ ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে আসে আমার লেখায়। আর আসে অন্ধ বিশ্বাসের নিগড় ভেঙে দেবার চেষ্টা। যা এই আংটি-কবচ-মহাপুরুষ-মহামানবী-জ্যোতিষ শাস্ত্রী’ গেরোন কালে হাঁড়ি ফেলো’র যুগে এক লড়াই বটে। সংস্কার ও বিজ্ঞানবিরোধীতা শিক্ষাসমাজকেও গ্রাস করেছে। তবে সমান্তরাল গড়ে উঠছে বিজ্ঞান চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগ্রামী মানুষ। সময়টা রাহু গ্রাস বা পূর্ণগ্রাসের। ‘বাঁয়েন’ কবে লেখা! সেদিন এক মহিলা ডোমের খবর পড়লাম তাকে চণ্ডীদাসের আপজন মনে হল।”^৬

-গল্পকারর বক্তব্যেই একথা স্পষ্ট যে, অন্ধ বিশ্বাসের নিগড় ভেঙে দেবার চেষ্টা থেকেই তিনি ‘বাঁয়েন’ গল্পটি লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, ডাকিনী-যোগিনী সম্পর্কে আদিম মানুষের যে চেতনা, ভয় ও কুসংস্কারের মধ্যে লালিত হয়ে বংশ বংশ ধরে মানুষের মনোলোকের অন্ধকারকে আশ্রয় করে আছে, তারই বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পটিতে।

‘বাঁয়েন’ গল্পে মলিন্দর হল শ্মশানের ডোম। সে ছাড়া তার অঞ্চলে কোনও ডোম নাম সই করতে পারত না বলে কিছুদিন পূর্বে মলিন্দর মহকুমার লাশঘরে কাজ পেয়েছে। মাঝে মাঝে বেওয়ারিশ মড়া চুন আর ব্লিচিং পাউডারে পচিয়ে সে হাড় বের করে নেয়, সরকারবাবু কলকাতার হবু ডাক্তারদের কাছে খুলি-হাড়-কঙ্কাল মোটা লাভে বেচে দেয়। বিনিময়ে মলিন্দর দশ-পনেরো যা পায় তাতেই খুশি থাকে। এই মলিন্দরেরই ভূতপূর্ব স্ত্রী, তার সন্তান ভগীরথের মা চণ্ডী গঙ্গাদাসী। তার পৈতৃক পেশা ছিল পাঁচ বছরের নীচে মৃত শিশুদের মৃতদেহ শেয়ালের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। কিন্তু একসময় এই পৈতৃক পেশাই তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের চাপে একসময় পেশা ছেড়ে দিলেও মাতৃবোধে তাড়িত হয়েই সে আবার এক আঁধার রাতে বটতলায় ছুটে যায় মৃত শিশুদের দেহগুলো রক্ষা করতে। এর ফল হয় মারাত্মক। ভীরা, কুসংস্কারে অন্ধ গ্রামবাসী তাকে ‘বাঁয়েন’ বলে সন্দেহ করে। আরও বড়ো ট্রাজেডি হল প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার ও সমাজের চাপে মলিন্দর নিজে তার স্ত্রীকে বাঁয়েন বলে ঘোষণা করতে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। সেদিন সে-

“ঢোলে কাঠি দিয়ে গ্রাম কাপিয়ে চাঁচিয়ে উঠেছিল-আমি মলিন্দর গঙ্গাপুত্র শোহরৎদেই। আমার বউ বায়েন হয়্যাছে গো বায়েন হয়্যাছে !”^৭

‘বাঁয়েন’ বলে ঘোষিত হবার পর চণ্ডী-কে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হয়। ধীরে ধীরে চণ্ডী নিজেও নিজেকে বায়েন ভাবতে শুরু করলেও স্বামী মলিন্দর ও সন্তান ভগীরথের প্রতি ভালোবাসা তার মধ্যে থেকেই যায়। কিন্তু চণ্ডী যে বাঁয়েন নয় একথা সে নিজে বুঝতে পারে প্রাণ দিয়ে একটা ট্রেনকে বড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবার সময়-

“ওরা বাঁশ নামাতে পারে না লাইন থেকে, সর্বনাশ ঠেকাতে পারে না। সমাজ চিরকাল এই করে, সমাজের এই কাজ। ওদেরই একজন একদিন ঢোল শোহরৎ দিয়ে ওকে বাঁয়েন করে দিয়েছিল। বাতাসে বৃষ্টির ঝাপট, চণ্ডী লণ্ঠনটা হাতে নিল। অসহায়, কী অসহায় চণ্ডী। ও যদি বাঁয়েন হয় তো ওর পোষা অন্ধকারের দানবগুলো এসে ওই ট্রেনটাকে থামিয়ে দিচ্ছে না কেন? সমাজ তো এই পারে শুধু-এই টুকু। কী অসহায় চণ্ডী, চণ্ডী এখন কী করে? লণ্ঠন হাতে চণ্ডী লাইন ধরে ছুটতে লাগল। এক হাত তুলে মানা করতে লাগল-এসো না, আর এসো না-গো, এখানে পাহাড়-প্রমাণ বাঁশ গাড়া। ট্রেন দূরন্ত ছেলের মতো কোনো বাধা না মেনে একেবারে চণ্ডীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।”^৮

-সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ ও চণ্ডীদাসীদের অসহায়ত্ব উভয়ই এক্ষেত্রে গল্পকার দ্ব্যর্থক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সমাজ একসময় যে চণ্ডীকে বাঁয়েন বলে ঘোষণা করেছিল, গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল নিজের জীবন দিয়ে সেই সমাজের লোকদের আসন্ন রেল দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে চণ্ডী বাঁয়েন প্রমাণ করে দিয়ে গেল যে, সে-ও রক্তমাংসের মানবিক গুণসম্পন্ন স্নেহময়ী জননী, বাঁয়েন নয়। এ যেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনী- ‘মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই।’^৯

আদিবাসী সমাজে পূর্বে প্রচলিত ছিল বাৎসরিক শিকারপর্ব। এই প্রথা এখনও বিহারে দেখা যায়। এটি ছিল তাদের ন্যায়বিচার উৎসব। শিকারের পর সমাজপতিরাই অপরাধীর বিচার করতেন, তাই বিচারের জন্য ওরা পুলিশের কাছে যেত না। সাঁওতালি ভাষায় একে বলা হয় ল-বির্। ‘ল’ মানে আইন, ‘বির্’ মানে জঙ্গল। আর প্রত্যেক ১২ বছর পর একবার আসে মেয়েদের পালা। তখন তাকে বলা হয় ‘জানী-পরব’। পুরুষদের মতো মেয়েরাও সে-সময় বেরোয় তির ধনুক বঙ্গম নিয়ে জঙ্গলে পাহাড়ে ছোটো। শজারু-খরগোশ-পাখি যা পায় তাই মারে। তারপর সবাই মিলে বনভোজন করে, মদ খায়, গান গায়, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। পুরুষরা যা যা করে, ওরাও ঠিক তাই করে। প্রত্যেক ১২ বছরে একদিন। হোলির আগুন জ্বেলে ওরা গল্প করতে বসে। বুড়িরা গল্প শোনে। প্রৌঢ়ারা রাঁধে আর জোয়ান মেয়েরা গান গায়। এই ‘জানী-পরব’-কে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর ‘শিকার’ গল্পটি। আর এই গল্পে বর্ণিত সকল ঘটনাই সত্য। গল্পকারর বয়ান থেকে আমরা জানতে পারি-

“সেদিন মেরি যা করে, ওখানে তা বারবার ঘটেছে। আদিবাসী সমাজে নারী ধর্ষণ, স্ত্রী লোককে অমর্যাদা, অবমাননা করা বৃহত্তম অপরাধ। ধর্ষণ ওরা জানে না। আদিবাসী সমাজে মেয়েদের সম্মান আছে। যখন লাপরা যেতাম, দেখতাম ফর্সা মেয়েটি দেহাতী ঢঙে (সামনে আঁচল দিয়ে) হলুদ শাড়ি পরে এক বিশাল মোষের পিঠে দিব্যি আরামে বসে আছে, আখ চিবোচ্ছে, কিংবা ভুট্টার খই। তোহরি বাজারে দেখেছি পান চিবোতে চিবোতে ফল ও শাকসবজীর দরাদরি করছে। বিড়িও খাচ্ছে, প্রচুর তর্ক করছে এবং জিতে যাচ্ছে। কি ব্যক্তিত্ব! পরে জানলাম, পছন্দের মুসলিম ছেলেটিকে বিয়ে করার জন্য জানী পরবের দিনে ও কি করেছিল।”^{১০}

‘শিকার’ গল্পের নায়িকা মেরী ওরাওঁ। মা ওরাওঁ হলেও পিতা অস্ট্রেলিয়ান হওয়ায় ও অন্যদের তুলনায় দীর্ঘাঙ্গী এবং গায়ের রং তামাটে ফর্সা, বয়স আঠারো, মুখ ও নাক চ্যাপ্টা। গ্রাম সমাজে ও স্বীকৃত। মেয়েরা ওর বন্ধু, পালাপার্বণে নাচতেও অধিতীয়া। তাহলেও শ্বেতাঙ্গ পিতার জারজ সন্তান বলে ওরাওঁরা ওকে নিজেদের রক্তের বলে মনে করে না এবং স্বয়ং স্ব-সমাজের কঠোর রীতিনীতি ওর ওপর আরোপ করে না। মেরী যেকোনো ওরাওঁ বাড়িতে বসে মাটির চাটুতে আটার পিঠে ভাজে, সকলের সঙ্গে খায় ঠিকই; তাই বলে ওদের মতো জীবনও কাটাতে চায় না। ও চায় একটু সুখ, একটু স্বাচ্ছন্দ্য। দূর থেকে ওকে খুব মোহনীয় দেখলেও কাছে গেলে বোঝা যায়, ওর চোখের ভাষায় খুব কঠিন এক প্রত্যাখ্যান রয়েছে।

কুরুডাতে শাল গাছ কিনতে এসে ঠিকাদার তশীলদার সিং হাত বাড়ায় এই মেরী ওরাওঁ এর দিকেই। মেরীকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা তার যতই প্রত্যাখ্যাত হয়, ততই মেরীকে পাওয়ার লালসা তার মধ্যে উদগ্র হয় ওঠে। তিজ বিরক্ত হয়ে অবশেষে মেরী ওকে একদিন ‘জানী-পরব’-এর দিন আসতে বলে। তশীলদার সিংও মেরীর মনের কথা বুঝতে না পেরে ফাঁদে পা দেয়। শেষ পর্যন্ত আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যখন-

“মেরী সাদরে তশীলদারের মুখে হাত বোলাল। ঠোঁটে চুমকুড়ি খেল। তশীলদারের চোখে আগুন, মুখ হাঁ, ঠোট লালমাখা, দাঁতে ঝিলিক, ...মেরী হেসে ওকে জড়াল। মাটিতে শোয়ালা, তশীলদার হাসছে, মেরী দা-টা ওঠাল, নামাল ওঠাল নামাল। ...মেরী বেরিয়ে এলো। নালার দিকে চলল। নালায় নেমে নগ্ন হয়ে স্নান করতে করতে ওর মুখ গভীর তৃপ্তি ভরে গেল। যেন পুরুষসঙ্গ করে অশেষ তৃপ্তি পেয়েছে ও। ...দূরে দূরে হোলির আগুন। অন্ধকারে, তারার আলোয় রেললাইন দেখে পথ চলতে চলতে মেরীর মনে কোন ভয় এলো না, কোন জানোয়ারের ভয়। আজকে ও সবচেয়ে বড় জানোয়ার মেরেছে বলে বন্য চতুষ্পদদের বিষয়ে সব প্রাত্যহিক, রক্তে অভ্যাসের ভয় ওর চলে গেছে।”^{১১}

-আসল কথা, সেদিন ছিল ‘জানী-পরব’। মেয়েদের শিকার উৎসব। সমগ্র আদিবাসী সমাজের চোখে যা পাপ, তার বিচার করে বাৎসরিক শিকার উৎসবের সত্য অর্থকেই মেরী পুনরুজ্জীবিত করেছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘শেষ ঝোকতা’ গল্পটিও এক লুপ্ত প্রথা অবলম্বনে রচিত। মারাঠাদের মধ্যে পূর্বে ‘ঝোকতা’ নামে এক ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল। তারা ছিল চতুর্ভুজা দেবী ইয়েলাম্মার ভক্ত। ইয়েলাম্মা পূজোর দিনে তারা বাড়ির প্রথম ছেলেকে ‘ঝোকতা’ করে দিত। পূজোর আগের দিন সেই ছেলেকে ভালোমন্দ খাওয়ানো হত। পরদিন মন্দিরে নিয়ে ন্যাংটো করিয়ে সপত্র নিমডাল ভেঙে তার সর্বাস্থে বাঁধা হত। তারপর সেই ছেলে মন্দির ঘিরে ঘুরে ঘুরে দেবীর পূজো দিত আর ছেলের মা বলত- ‘এতদিন ছিল মায়ের ছেলে ! আজ হতে তুমি দেবীর হলে।’ পূজো শেষ হলে তাকে শাড়ি ও জামা পরানো হত। তার চুল কাটা নিষিদ্ধ। কারণ

ঝোকতাকে স্ত্রী বেশে থাকতে হয়। ঝোকতা দেবী ইয়েলাম্মার ডালা নিয়ে ঘুরবো ভিক্ষা চাইবে না। বলবে- ‘মালা ! ঝোকতা আলে !’ অর্থাৎ ‘মা, ঝোকতা এসেছে’ ঝোকতা বিয়ে করতেও পারবে না। তাই দেহ থেকে কামভাব দূর করার জন্য তাকে রোজ একটা করে কাঁচা হরিতকী খেতে হয়। মরার পর তার কোনও সৎকার নেই। বাড়ির গোপন স্থানে থাকে ঝোকতার সমাধি ঘর। মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন ওরা সেখানে চলে যায়। উঁচু পাড়ের কুয়ো। ঝোকতা পাড়ে বসে থাকে। মরণ এলে ভিতরে পড়ে যায়। ‘শেষ ঝোকতা’ গল্পে গুণ্ডাপ্পা গোকুল পানির শেষতম ঝোকতা, যার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরীভূত এক প্রাগৈতিহাসিক বৃক্ষের পতন ঘটে।

ছোটগল্পে সাধারণত গানের ব্যবহার না থাকলেও মহাশ্বেতা দেবী সুকৌশলে তাঁর গল্পে গান ব্যবহার করেছেন। কারণ আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে গান অঙ্গঙ্গিভাবে জড়িত। তাদের তো কোনও লিখিত সাহিত্য নেই, তাই যখন যা ঘটে, তাই নিয়েই ওরা গান বাঁধে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ভালোবাসা, যুদ্ধ, লড়াই প্রাকৃতিক বিপর্যয়-সকল স্মৃতিই ওরা ধরে রাখে গানে গানে। ‘সাঁঝ সকালের মা’ গল্পে আমরা জটির স্বামী- উৎসব কান্দোরির পরিচয় পাই, যে গান বাঁধত, গান গাইত। গল্পে তার কণ্ঠে গান ব্যবহৃত হয়েছে তিনবার-

১. “ও নীল শাড়ি, আঙা মেয়ে / দেখ চেয়ে / তোর লেগে মোর পরাণ জ্বলে যায়।”^{১২}

২. “ও পাখি ধরে কী হবে সখী / মোর প্রাণপাখি এনে ফেলে দিব তোর পায়ে / হা তোর লেগে মোর পরাণ জ্বলে যায় !”^{১৩}

৩. “ওরে তোর মিছে ভয় / পিরিত ফাঁদে ধরা দিতে কেন এত ভয় !”^{১৪}

-বোঝাই যায় গানগুলো জটিকে উপলক্ষ্য করে রচিত। গানগুলোর মধ্য দিয়ে উৎসব জটির প্রতি নিজের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। ভালোবাসা ও গান, এই দুয়ে মিলিয়েই শেষ পর্যন্ত জটি উৎসবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিল, নিজে জরা ব্যাধের বংশধর হয়েও ভিন জাতের বেদিয়া উৎসব কান্দোরিকে বিয়ে করতে পেরেছিল। গান এখানে দুটি হৃদয়কে কাছে আসতে সাহায্য করেছিল।

‘শিকার’ গল্পের মেরী ওরাওঁ-এর কথাও গল্পকার আদিবাসীদের গান শুনেই জেনেছিলেন। গল্পে গানের ব্যবহার রয়েছে দু’বার। প্রথম গানটি গেয়েছে প্রৌঢ়া সোমরি আর দ্বিতীয়টি সকলের যৌথ সংগীত-

১. “হোলিতে আগুন রে হোলিতে আগুন / তুমি দেখে দেখে ঘরে এসো ভুলে থেক না”^{১৫}

২. “হে হরম্‌দেও / এমন হোলি বছর বছর হোক- / এমন শিকার বছর বছর করি- / মদ দিব তোমাকে / মদ দিব-”^{১৬}

গল্পে গানদুটিকে কেন্দ্র করে হোলির দিন ‘জানী-পরব’-এর উৎসব জমে উঠেছে। ‘জানী-পরব’-এ মদ, গান আর নাচ -এই তিনটি জিনিস অবশ্য প্রয়োজনীয়। এছাড়া গানটির মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি ওরাওঁ সমাজে পালা-পার্বণে দেবতাকে মদ উৎসর্গ করার প্রথাও রয়েছে। গানের মধ্য দিয়ে আমরা আদিবাসী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের ছবিও পেয়ে থাকি। যেমন ‘কুড়োনির বেটা’ গল্পের একটি গান-

“পাহাড়ে পর্বতে যামু আলু-তুঙ্গা খামু / যাহায় দেখমু খন্তা কোদাল তাহার সঙ্গে যামু /

মারিব শাবলের গুঁতা আলু-তুঙ্গা বার করামু, / আলু-তুঙ্গা খামুরে পাহাড়-পর্বত যামুরে...”^{১৭}

-লোখা জাতির বিবাহ অনুষ্ঠানে এই গানটি গাওয়া হয়। এই গান থেকে আমরা তাদের খাদ্যাভ্যাস ও ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের ধারণা পাই।

মহাশ্বেতা দেবী বাস্তব জীবনের রূপকার বলেই আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত সমাজচিত্রকে নিজের লেখনীমুখে তুলে এনেছেন। তাঁর বিভিন্ন গল্প থেকেই আমরা জানতে পারি আদিবাসীরা করম, সোহরাহ, ধরমপুজো, কালীপুজো,

মনসাপুজো, বনবিবি বা বনচণ্ডীর পুজো করে থাকে। তবে তাদের মনসাপুজো যে একটু অন্যরকম তা জানা যায় ‘জল’ গল্প থেকে। গল্পকার আমাদের জানিয়েছেন-

“মনসা পূজা মঘাইদের অন্যরকম। মঘাই আগে মনসাপুজো করল। তারপর মুখে রং মেখে, মদ খেয়ে সং সেজে গান গাইতে গাইতে পাহাড়ের ওপর দিয়ে সার বেঁধে ওদের বাঁধের দিকে গেল। আজ ঝিরঝিরে বৃষ্টি, বাতাসে ঝাপট। ওরা গাইছিল-

শঙ্কিনী চিত্রাণী লাগে মায়ের কাঁচলা / চিত্তিবোড়া লাগে রচে মায়ের আঁচলা / কাজলিয়া লাগে মায়ের লয়ানে কাজল / পাতুড়িয়া লাগে মাতা পায়ে পরে মল-

নাচতে নাচতে মঘাইরা চরসার ধারে গিয়ে ঘট ডোবালা। তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে অভ্যস্ত উপসংহার হিসেবে প্রচুর মদ খেলা।”^{১৮}

-এই গল্পে মঘাইদের পুজোর কথা বলে গল্পকার একই সঙ্গে দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। প্রথমত, এর ফলে আমরা তাঁদের বিশেষ লোকাচার সম্বন্ধে অবহিত হই। দ্বিতীয়ত, জলের জন্য মঘাইদের হাহাকার যে কতটা তারও মাত্রা বোঝা যায় চরসার বাধে জল জমলে উচ্ছ্বাসপ্রকাশের মাত্রা দেখে। জলের জন্য হাহাকার থেকেই বৃষ্টি আসার জন্য তারা নানারকম ক্রিয়াকর্মও করে থাকে। সেরকমই এক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে ‘আজীর’ গল্পে-

“এবারে খরা বড়ো বেশি। ...জল চেয়ে মানুষ কত ক্রিয়াকাণ্ডই যে করল। গ্রামের পাঁচজন একত্র হয়ে পাঁচ বাড়ির মেয়েকে দিয়ে রাজার দিঘির মরা বুকে কাড়া ডাকল। বলির পাঠার রক্ত চৌচির মাটির বুকে নিমেষে শুষল, জল হল না। আকাশ ধূমলবর্ণ। রাতেও আকাশে অন্ধকার নামে না। জল, জল বলে হাহাকার উঠে গেল। গ্রামের সবচেয়ে নষ্ট মেয়ে পুন্নশশীকে শ্মশানতলার মা বললেন ‘যা বলি তাই কর।’ গ্রামের সবাই অমাবস্যার রাতে দোরগোড়ায় দুধে জলে একবাটি রেখে দোর দিল। পুন্নশশী উদ্যম হয়ে মাথায় বীজ ধানের সরা নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে সেই দুধ জল নিল, ভাঁড়ে তালল। তারপর রাজার দিঘির বুকে সেই বীজধান আর দুধ জল ঢালল। কাঁপতে কাঁপতে পুন্নশশী ফিরে গেল ঘরো।”^{১৯}

আদিবাসী জীবনে অরণ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অরণ্যের বহু বৃক্ষ তাদের ফল দেয়, মাটি সংলগ্ন ঝোপঝাড়, লতা দেয়, কন্দ, মূল, অন্ন, কাঠ, ঘর তৈরির উপাদান। বনে থাকে মৃগয়ার পশু। তারা মনে করে এই অরণ্য রক্ষা করে দেবী বনচণ্ডী বা বনদুর্গা। শবরদের প্রাচীন কিংবদন্তি অনুযায়ী এই দেবী বনদুর্গা শবরদের প্রধান শত্রু গামাসুরকে বধ করেছিলেন। গামাসুর ছিল মায়ারী, অনেক ছল-ছলনাই সে জানত। আর শবররা ছিল অরণ্যসন্তান, অরণ্যের মতোই নিষ্পাপ। এক শ্রাবণ পূর্ণিমার রাতে আকাশে যখন চাঁদ আছে, অথচ কালো মেঘ খরস্রোতে ভেসে যাচ্ছে, অরণ্যভূমি যখন অপার্থিব রহস্যে ঢাকা, তখন দেবী বনদুর্গা গামাসুরকে বধ করেছিলেন। সাবস্ত্রা এই দেবীর এক হাতে ধনুক, অপর হাতে খড়্গ। সেইদিন থেকে শ্রাবণ পূর্ণিমা শবরদের কাছে গামাপূর্ণিমা। এই দিনটি তারা নাচে-গানে-উৎসবে বনদুর্গার পুজোয় কাটায়। অরণ্যের আধিপত্যবাহিনী দেবী এই বনদুর্গার ও তার লোককথা মহাশ্বেতার ‘সাঁঝ সকালের মা’, ‘কুড়োনির বেটা’, ‘লাইফার’, ‘অন্ন অরণ্য, অন্ন অরণ্য’ ‘সংরক্ষণ’, সহ অসংখ্য গল্পে বারবার এসেছে। ভ্রান্ত সরকারি নীতি ও সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণে যতই প্রাচীন অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে ততই আদিবাসীদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। তাই তারা দেবী বনচণ্ডীর কাছে আর্তি জানাচ্ছে প্রাচীন অরণ্য ফিরিয়ে দেবার। ‘সংরক্ষণ’ গল্পে মহাশ্বেতা দেবী এরকমই এক লোখা সেপাই-এর আর্তির কথা তুলে ধরেছেন-

“হা মা বড়ামচণ্ডী ! হা মা শীতলা ! বনচণ্ডী মা গো ! শারদ শিশির সিক্ত প্রসন্ন প্রভাতে তোমার শবর সন্তান যায় কোথা? এ বন কে কাটল, কবে কাটল? ...জঙ্গলটা চুরি হই গেল মা গো ! তুমিও অক্ষ্যমতা ?”^{২০}

-লোখা শবরদের জীবনের ট্রাজেডি এটাই যে, যেন দেবী বনচণ্ডী তাদের আর রক্ষা করতে পারছেন না !

মহাশ্বেতা দেবীর বিভিন্ন গল্পে আদিবাসী লোকসমাজের বেশ কিছু দেবদেবীর টুকরো টুকরো ছবি ফুটে ওঠে। যেমন, ‘বনচণ্ডী’ ছাড়াও লোখারা বড়াম মা, বাঘুত (যে দেবতা বাঘের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে) মুন্ডারা গিরিং, সিংবোঙ্গা, জাহের

এরা-র পূজো করে। মুন্ডাদের প্রধান দেবতা হলেন এই সিংবোঙ্গা বা সূর্যদেবতা। প্রতি উৎসব এবং অনুষ্ঠানই তারা সিংবোঙ্গার উদ্দেশ্যে পূজো নিবেদন করে। তাদের বিশ্বাস সিংবোঙ্গাই এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। পূজা-পার্বণে সাধারণত সাদা মোরগই সিং বোঙ্গার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। সিংবোঙ্গার পরই ‘জাহের এরা’ এবং ‘চণ্ডীবোঙ্গা’-র স্থান। চাষ-আবাদ ভালো হওয়ার জন্য ‘জাহের এরা’-র উদ্দেশ্যে এবং শিকারে গিয়ে যাতে কোনও বিপদ আপদ না হয় সেজন্য চণ্ডী বোঙ্গার উদ্দেশ্যে পূজো দেওয়া হয়। এছাড়া ‘ইকিড়বোঙ্গা’ (নদী ও জলাশয়ের দেবতা), ‘বুরুবোঙ্গা’ (পাহাড় পর্বতের দেবতা) ‘নাগে এরা’ (ছোটো ছোটো নদী নালার দেবী) প্রভৃতি তাদের উল্লেখযোগ্য দেবদেবী। মুন্ডাদের বিশ্বাস, এ সমস্ত দেবদেবী তাদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। সাধারণত গ্রামপুরোহিত ‘পাহান’ উল্লেখিত সমস্ত দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পূজো দেন। এছাড়া প্রতিটি মুন্ডা পরিবারেই নিজস্ব ‘ওড়াবোঙ্গা’ গৃহদেবতা আছে। গ্রামের অন্যান্য দেবদেবীর (হাতুবোঙ্গা) মতোই তারা ওড়াবোঙ্গাদের উৎসব অনুষ্ঠানের সময়ে স্মরণ করে এবং সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানায়। এ সমস্ত দেবদেবী ছাড়াও আছে শ্মশানরক্ষক ‘শ্মশানবোঙ্গা’, কলারার দেবী ‘হায়জাবুড়ি’, বসন্তের দেবতা ‘চেচকবুড়ো’ ইত্যাদি। শুধু মুন্ডা সমাজেই নয় কোল, হো, ভূমিজ, বিরহড়, মাহালি প্রভৃতি উপজাতিদের কাছেও সূর্যদেবতা বা সিং বোঙ্গা প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত হন। এছাড়া সাঁওতাল, ওরাওঁ সমাজেও সিংবোঙ্গা পূজিত হয়ে থাকেন। অর্জুন গাছকে কখনও কখনও তারা গ্রামদেবতা হিসেবে মনে করে। তখন বিয়েতে, পরবে সেখানে গিয়ে ঢোল ধামসা বাজায়, মানসিকের চুল ফেললে সেখানে পুঁতে দেয়, বাধনা জাগরণে গোরু নাচায়। অন্যদিকে শালগাছ তাদের কাছে বন্ধুত্বের প্রতীক।

এ সকল বিষয় ছাড়াও আমরা মহাশ্বেতা দেবীর বিভিন্ন ছোটগল্প থেকে আদিবাসী সংস্কৃতির বস্তুকেন্দ্রিক উপাদানও পেয়ে থাকি। যেমন, তারা খাদ্য হিসেবে যেসব গ্রহণ করে থাকে সেগুলি হল- আলু, তুঙ্গা, পানআলু, চুরকা আলু, মধু, ধুনা, কান্দা, কাঁটা আলু, চুন আলু, কেঁদ, ভররু, ভুঁইকুমড়া, বেঁহচি, কুল, সোঁয়াকুল, বদাকুল, পিয়াল, আমলকী, মছয়া ফুল বেল-শাক, খরা সজারু, ভাত। অস্ত্র রূপে ব্যবহার করে- তির, ধনুক, বর্শা, বল্লম, কুড়াল। উৎপাদনের কাজে যেসব সরঞ্জামগুলি তারা ব্যবহার করে- ঝুড়ি, কোদাল, কাস্তে, বাঁটা, খস্তা। নেশা করা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ। বিভিন্ন গল্পে মছয়া ফলের মদ, ভাত পচিয়ে তৈরি করা মদ (হাঁড়িয়া), তালের রস থেকে তৈরি মদ (তাড়ি), তামাক পাতা, চুন –এই নেশাদ্রব্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া বিচ্ছেদ কামড়ালে থেতো করে লাগানোর জন্য আকুলির বীজ নামক ঔষধির উল্লেখ রয়েছে।

Conclusion: সমগ্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী লোকসংস্কৃতি কেবল একপ্রকার বর্ণনামূলক অলংকার নয়; বরং তা মূলধারার সভ্যতার চাপে বিপন্ন এক জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের ও প্রতিরোধের স্বরকে স্পষ্ট করে তোলে। আধুনিক নগরায়ন, বাণিজ্যিক শোষণ এবং অন্ধ কুসংস্কারের মুখে আদিবাসী জীবনের যে অবক্ষয় ঘটছে, গল্পকার তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গল্পে উন্মোচন করেছেন। আদিবাসী লোকজীবন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর যে প্রতিনিয়ত আক্রমণ চলছে সেকথা তিনি অন্যত্র সরাসরি লিখেছেন-

“আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি চেতনা, সভ্যতা, সব মিলিয়ে যেন নানা সম্পদে শোভিত এক মহাদেশ। আমরা, মূলস্রোতের মানুষরা, যে মহাদেশকে জানার চেষ্টা না করেই ধ্বংস করে ফেলেছি, তা অস্বীকার করার পথ নেই।”^{১১}

আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি মহাশ্বেতা দেবীর গভীর সহানুভূতি ও সুনিবিড় সখ্যতাই তাঁর গল্পগুলোকে কোনো কৃত্রিম প্রচারপুস্তক না বানিয়ে বাস্তবসম্মত জীবন্ত দলিল করে তুলেছে। লোকজীবনের এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রয়োগ তাঁর সাহিত্যের শৈল্পিক মান অক্ষুণ্ণ রেখে গল্পকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

Reference

- (১) <https://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism>
- (২) দেবী, মহাশ্বেতা। (২০১৩)। শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ভূমিকার পরিবর্তে

- (৩) পূর্বোক্ত, শ্রেষ্ঠ গল্প, শেষ শামানিন, পৃষ্ঠা- ২৮২
- (৪) পূর্বোক্ত, শেষ শামানিন, পৃষ্ঠা- ২৮৫
- (৫) পূর্বোক্ত, শেষ শামানিন, পৃষ্ঠা- ২৯১
- (৬) দেবী, মহাশ্বেতা। (১৯৯৬)। মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা- ভূমিকাংশ
- (৭) পূর্বোক্ত, মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, বাঁয়েন, পৃষ্ঠা- ২১৮
- (৮) পূর্বোক্ত, বাঁয়েন, পৃষ্ঠা- ২১৯
- (৯) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৩৩)। গল্পগুচ্ছ, জীবিত ও মৃত, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ১৫৪
- (১০) ঘোষ, নির্মল। (১৯৯১)। মহাশ্বেতা দেবী : অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ, করুণা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ১১৫
- (১১) দেবী, মহাশ্বেতা। (১৯৯৩)। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন, শিকার, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, পৃষ্ঠা- ৫৮-৫৯
- (১২) পূর্বোক্ত, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন, সাঁঝ সকালের মা, পৃষ্ঠা- ৬৯
- (১৩) পূর্বোক্ত, সাঁঝ সকালের মা
- (১৪) পূর্বোক্ত, সাঁঝ সকালের মা, পৃষ্ঠা- ৭২
- (১৫) পূর্বোক্ত, শিকার, পৃষ্ঠা- ৫৭
- (১৬) পূর্বোক্ত, শিকার, পৃষ্ঠা- ৫৯
- (১৭) পূর্বোক্ত, মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প, কুড়োনির বেটা, পৃষ্ঠা- ৪১৭
- (১৮) দেবী, মহাশ্বেতা। (২০০৩)। মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র- ৮, জল, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ৪৩২
- (১৯) দেবী, মহাশ্বেতা। (২০০১)। মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র- ১, আজীর, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ৪৯৩
- (২০) পূর্বোক্ত, শ্রেষ্ঠ গল্প, সংরক্ষণ, পৃষ্ঠা- ২৬৪
- (২১) দেবী, মহাশ্বেতা। (২০০৪)। টেরোড্যাকটিল পূরণ সহায় ও পিরথা, মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র- ১৪, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ভূমিকা অংশ

Citation: Roy. T., (2026) “মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে আদিবাসী লোকজীবন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-07, July-2026.